রিচার্ড বি. গ্রেগ

কর্মের সন্ধান

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

গান্ধী স্মারক নিধি
বাংলা

কর্মের সন্ধান

[রিচার্ড বি. গ্রেগ কৃত 'I Want A Job' পুস্তকের বঙ্গানুবাদ]

শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত

সর্বোদয় প্রকাশন সমিতি
সি ৫২, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

Karmer Sandhan is the Bengali translation of the book 'I Want A Job' by the well known Gandhian writer Richard B. Gregg. It deals with the problem of educated unemployment in India, with particular reference to the needs of agriculture in an over-all scheme of rural development.

প্রকাশক : শ্রীশক্তিরঞ্জন বসু
সম্পাদক, গান্ধী স্মারক নিধি (বাংলা)
৭১ সদর বাজার রোড,
বারাকপুর (২৪-পরগনা)

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৬৯ (ডিসেম্বর ১৯৬২)

মুদ্রণ-সংখ্যা : ২২০০

মূল্য : ০·৭৫ ন. প.

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং প্রাইভেট লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

১

দেশের যুবসম্প্রদায় কী কাজে নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে, যাতে তারা নিজেদের সার্থক মনে করবে?

কাজ বলতে আমি এমন কোন পেশার কথা বলছিনে যা স্বাদহীন, প্রাণহীন, বৈচিত্র্যহীন, অর্থহীন—অর্থ রোজগারের উপায় মাত্র।

ছেলেমেয়েরা পছন্দ করবে কেমন কাজ? যে কাজের ডাকে জাগবে আগ্রহ, যে কাজ করতে উৎসাহ আপনিই আসবে—মাঝে মাঝে উত্তেজনাও ঘটবে। যে কাজে বৈচিত্র্যের আকর্ষণ থাকবে, আবার যার গভীর মূল্যবোধে মনে তৃপ্তি আসবে। সে কাজের সাধনে—নিত্য-নব তথ্যের সন্ধানে বুদ্ধি দৌড়বে আর হৃদয়ও আবেগে অধীর হয়ে ছুটবে।

সংসারের সকল কাজই, এমনকি প্রধানমন্ত্রী বা বৈজ্ঞানিকের কাজও, সময়ে সময়ে উত্তেজনাহীন, একঘেয়ে ভাবে চলতে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে একাদিক্রমে নেশার উত্তেজনা নিয়ে চলাও সম্ভব নয়। এইসব বিচার করে এমন কাজ গ্রহণ করতে হবে, যে কার্যসাধনে চিরকালই উৎসাহ বজায় থাকবে—যে কর্মসাধনে সারাজীবন ব্যয় করলেও তার মহিমা ফুরবে না। যে কাজে আরও পাঁচজন নিষ্ঠাবান কর্মীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে, কাঁধ মিলিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে এগিয়ে চলতে হবে—সারাজীবন চলার পরও পথের ইঙ্গিত,

আদর্শের প্রেরণা একই ভাবে বলবৎ থাকবে। এমন কাজ যদি কেউ বেছে নিতে পারে—কত না আনন্দ তার জীবনে ঘটবে!

যখন আমি ছেলেমেয়েদের কথা বলি তখন বয়স ভেবেই যে বলি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই দলের মধ্যে আমি তাঁদেরও গণ্য করি, যাঁরা বয়সে বড় হলেও মনের আগ্রহে যুবকদের দলে। যাঁদের আছে কর্মশক্তি, আশা, সংজীবনের জন্য আগ্রহ, নূতন কিছু করার সাহস, ভবিষ্যতের আশায় বিশ্বাস, ধৈর্য আর এই ভরসা যে, যে-কোন বাধাই আসুক না কেন, মানুষ চেষ্টা করলে তা অতিক্রম করতে পারবে। হয়তো এমন অনেক বাধা তাঁরা অতীত জীবনে পার হয়ে এসেছেন।

আরও মনে করিয়ে দিই—এ কাজে আমি মেয়েদের কথাও বিশেষ করে ভাবছি। এই দলে যুবক ও যুবতী দুইই আছেন।

এখন দেখা যাক, আমাদের দেশে কাজের ক্ষেত্রে কোথায় কী সম্ভাবনা আছে।

সকলেই এ কথা বলে থাকেন যে, ভারতে বহু জটিল অবস্থা ও সমস্যার জট পাকিয়ে এক পরম জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যাগুলি কিছু নূতন ও কিছু পুরাতন। এর মধ্যে এমন অনেক সমস্যা আছে যেগুলির সমাধান করা যায় না—চেষ্টা করলে বাধা বাধাই থেকে যায়। জটিলতা যেখানে এত বেশী, সেখানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা না করাই ভালো। সমাজের ইতিহাসে, মনুষ্য-বুদ্ধির বাইরে, এমন অনেক বিবর্তন ঘটে গিয়েছে ; যা ছিল তাকে ঢেকে নূতন জীবন বিকশিত হয়ে

উঠেছে। তাই এই সব জটিলতার সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে তাদের এড়িয়ে নূতন পথে চলার রসদ ধীরে ধীরে সংগ্রহ করে নূতন মন্ত্রের উদ্ভাবন করতে হয়। তিলে তিলে বিচারের ধারা পরিবর্তন করে নূতন পথে মানুষকে নূতন হয়ে বাঁচতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে যে, মানুষের বিচার দ্বারা, কৌশল ও ধৈর্যের দ্বারা, দয়ার দ্বারা, প্রতিটি মানুষের প্রতি সন্মানের দ্বারা এবং প্রতিটি ব্যক্তিত্বের মধ্যেই সু-সাধনের বিপুল সম্ভাবনা আছে এই বিশ্বাসের দ্বারা মানুষ নিজের চেষ্টাতেই নব নব ধারায় জীবনকে প্রবাহিত করতে পারবে।

এই কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, ভারতের যত কিছু সমস্যা সব একই প্রশ্নের মধ্যে নিহিত আছে—কেমন করে ভারতের এই বিপুল দুর্গত জনসমাজকে ভালো করে খাওয়ানো-পরানো যাবে, কেমন করে তাদের মনে আশা জাগানো যাবে, কেমন করে ভারত আধুনিকতার স্তরে উন্নীত হয়ে মানুষের জয়যাত্রায় যোগ দেবে।

এই বিরাট্ কাজে অংশ গ্রহণ করে কিছুমাত্র সফলতা লাভ করলে সকলেরই জীবন ধন্য হবে, আর পরিতৃপ্তিও হবে গভীর। সমস্যা বিরাট্ ও বহুমুখীন। এই বিপুল সমস্যা-প্রবাহের কোন্ ধারাটিতে জীবনতরী ভাসালে পথ হবে মনোরম তাই ভেবে দেখতে হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে কোন্ চেষ্টা সর্বোত্তম? সেই কাজই কি সর্বোত্তম, যার ফল সবচেয়ে ব্যাপক জায়গায় পরিব্যাপ্ত হয়ে সবচেয়ে বেশী লোকের উপকারে লাগে? সেই

কাজই কি শ্রেষ্ঠ, যা দেশের প্রগতির গভীরতম উৎস উন্মোচন করে? অথবা দেশে প্রচলিত বৃত্তিগুলি, যেমন আইনের ব্যবসায়, চিকিৎসা বৃত্তি, শিক্ষকতা, সৈনিক বৃত্তি, রাজনীতি চর্চা, বিজ্ঞান চর্চা, কারিগরী বিদ্যা ইত্যাদি এক বা একাধিক বৃত্তির চর্চাই কি সর্বোত্তম কাজ? অথবা শ্রেষ্ঠ কাজ কি এমন কোন কর্ম, যা প্রচলিত না থাকলেও শীঘ্রই প্রচলিত হবে? অথবা কোন নূতন গবেষণা বা গবেষণা-প্রসূত ফলের বাস্তব প্রয়োগই কি সর্বোত্তম?

কোন্ কাজ সর্বোত্তম—এ প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসুর রুচি, প্রকৃতি, বুদ্ধি ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। যে কাজ আমার পক্ষে যোগ্য বলে মনে হবে তা অপরের ভালো না লাগলেও তার পছন্দমত কাজটি দেশের পক্ষে বা প্রদেশের পক্ষে বা গ্রামের পক্ষে সমানই মূল্যবান হতে পারে। মানুষের সভ্যতার গতি দুর্জ্ঞেয়, তাতে সকল রকম শক্তি, কৌশল ও বিদ্যা কাজে লাগে।

অন্য দিক থেকে দেখলে, ক্ষমতা লাভ করা ও পরিচালনা করার ব্যাপারে অনেকেরই একটা মোহ আছে। ক্ষমতা আসে বস্তু থেকে—যেমন স্টীম থেকে, জল থেকে, কয়লা থেকে, পেট্রোল থেকে, বা বিদ্যুৎশক্তি থেকে। আবার কেউ চায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতা বা রোগ নিরাময় ক্ষমতা বা কল্পনার শক্তি বা সাংবাদিকতার শক্তি বা শিক্ষকতার প্রভাব বা অর্থের শক্তি বা কর্মপরিচালন ক্ষমতা অথবা সৈনাপত্যের ক্ষমতা।

এই ছোট পুস্তিকাতে সকল রকম কাজের বিবরণ দেওয়া বা তাদের প্রত্যেকের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যের বিচার করা সম্ভব নয়। কেবল এক বিশেষ ধরনের কাজের বর্ণনা করা যেতে পারে ও তার সার্থকতার পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। আমার লেখাটা পড়ে অন্যে বিচার করতে পারবেন। আমি যে কাজের বিষয় বলব তা পড়ে যদি সে কাজ গ্রহণ নাও করেন তা হলেও এতে তাঁর নিজের কাজের ধারা নির্ণয় করার সাহায্য হবে। কাজেই এটা পড়ে দেখলে কিছু লাভ হবেই।

পরিপক্ব হতে আমার নিজের বহু সময় লেগেছে। নিজেকে ঠিকমত বুঝতে আর আমি কী করতে পারি এবং সবচেয়ে বেশী করে করতে চাই তা জানতে অনেক বছর কেটে গিয়েছে। অনেক যুবকই বুঝতে পারেন না কোন্ কাজটা করার যোগ্যতা তাঁদের সর্বাধিক আছে। এটা বোঝবার একটা কৌশল হচ্ছে নিজেকে প্রশ্ন করা: "অবসর সময়ে আমি কী করি? অন্য-মনস্ক হয়ে আমি কী করি? ছুটির দিনে কী করতে ইচ্ছা করে? কী পড়তে বা শুনতে আমার ইচ্ছা করে? যদি কিছু অর্থ আমি পাই তা হলে কিসে তা খরচ করতে ইচ্ছা হয়? আমার কল্পনা কোন্ দিকে ছুটে যেতে চায় বা কোন্ কাজ করছি বলে কল্পনা করতে আমার ভালো লাগে?" এই সব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে নিজের নিজের স্বভাব, রুচি ও কামনা বোঝা যায়। প্রত্যেকেই নিজের স্বভাব, রুচি ও কামনা অনুযায়ী কাজ নির্বাচন করলে সবচেয়ে ভালো কাজ করতে পারবে।

কোন্ কাজ বেছে নেব তার আলোচনায় আর অগ্রসর হবার পূর্বে আমি টাকার বিষয়ে একটু বলে নিতে চাই। টাকার সঙ্গে আমাদের জীবনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রয়েছে, বিশেষ করে কাজের সঙ্গে। কী কাজ করব তা ভাবলেই কত টাকা পাব তাও ভাবতে হবে। টাকার পরিমাণ বুঝে কর্ম নির্বাচন রেওয়াজ হয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে কিছু বলার মত অভিজ্ঞতা আমার সঞ্চয় হয়েছে। এটা স্পর্ধা নয়, কারণ আমার বয়স এখন পঁচাত্তর আর আমি রোজগার করেই বেঁচেছি। আমার জীবনে প্রথম রোজগার করেছি মজুর খেটে ষোলো বছর বয়সে। মাস্টারি করেই আমি কলেজ ও আইন বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করতে পেরেছি। বড়লোক আমি কোনদিনই হইনি। বই লিখে খুব অল্প পয়সাই পেয়েছি, কারণ আমি যে রকম বই লিখি তাতে পয়সা আসে না। কেবলমাত্র এক বছর আমি বই থেকে পাঁচ শ' টাকা পেয়েছিলাম। সেই হচ্ছে আমার সব থেকে বেশী পাওয়া—এই বত্রিশ বছর ধরে বই লেখার জীবনের মধ্যে। ওকালতি করেছি তিন বছর আর সাত বছর ধরে মজুর-সংক্রান্ত আইনের কাজ করেছি। নয় বছর আমি চাষের কাজে মজুর হয়ে খেটেছি আর আজও আমি একটা ছোট বাগানে কাজ করছি।

আমি বলব, টাকার জন্য কাজ করো না, কাজ করতে হবে লোকের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করার জন্য। কাজে যদি এমন দক্ষতা, সাধুতা, পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও বিচারবুদ্ধি দেখাতে পারা যায় যে, লোকে বোঝে যে সমাজের কল্যাণের জন্য দীর্ঘকাল

খাটতে তুমি প্রস্তুত এবং যত তুমি নেবে তার চেয়ে বেশী দিতে চাও তা হলে আর পয়সার জন্য চিন্তা করতে হবে না—তোমার যা প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ আপনিই আসবে। টাকা হল মানুষের এই আস্থার প্রতীক মাত্র, যাকে মহাজনরা বলে 'ক্রেডিট'। আসল জিনিস টাকা নয়, সমাজমনের এই আস্থা, এই শ্রদ্ধাই হচ্ছে আসল জিনিস। প্রতীকটার জন্য কাজ না করে আসল বস্তুর জন্যই খাটা ভালো। এর সুবিধা এই যে, আর্থিক বিভ্রাটে—যেমন ১৯৩৩ সনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছিল, ব্যাঙ্ক কাজকর্ম বন্ধ করে দেয়, কেউ আর টাকা পায় না ; কিন্তু সমাজমনের উপর ভরসা থাকলে কোন দুশ্চিন্তাই নেই। ব্যাঙ্ক বন্ধ হলে টাকা বন্ধ হবে, কিন্তু সমাজ-মনের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কোন পরিবর্তন হবার ভয় নেই। অর্থ-বিভ্রাট, ব্যবসা মন্দা, বেকারত্ব বৃদ্ধি কোন অবস্থাতেই লোকের মনের বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে না।

এই কারণেই আমি বলি যে, টাকার পরিমাণের উপর কর্ম-নির্বাচন নির্ভর করলে ভুল হবে। কাজের সত্যকার মূল্য সমাজের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, তাতেই ভরসা রাখা উচিত, যদিও সে মূল্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা যাবে না। আর কাজ বেছে নিতে হবে নিজের স্বভাব-দক্ষতা, শিক্ষা ও আদর্শ অনুযায়ী। সেই কাজই গ্রহণ করতে হবে যেটা করে প্রত্যেকে নিজ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সমাজমনের সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে।

কাজ সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা এইখানে শেষ করে এখন আমার কাছে যে কাজ ভারতের উন্নতির জন্য একান্ত মূল্যবান

বলে মনে হয়, সেই কাজের কথাই বলি। এই সঙ্গে কেন আমি এই ধরনের কাজকে সবচেয়ে জরুরী বলে মনে করি ও এই কাজ কর্মীর জীবনে গভীর স্থায়ী তৃপ্তি, শ্রদ্ধা ও উৎসাহ আনতে পারবে বলে বিশ্বাস করি তাও বলছি।

সকলেই জানেন, ভারতে শতকরা আশিজন লোক গ্রামে বাস করে। বাকী কুড়িজন যারা শহরে থাকে তাদেরও অনেকে গ্রামেই জন্মেছে ও সেখানেই বড় হয়েছে—তারপর তারা শহরে এসেছে।

এটাও সবাই জানেন যে, শহরের লেখাপড়া জানা লোক গ্রাম্য জীবনকে ও গ্রামের লোকদের হেয় মনে করেন। মহা-পণ্ডিত কার্ল মার্ক্‌স্‌ও ছিলেন শহরের লোক। তিনি চাষ বা চাষীর জীবন সম্বন্ধে বেশী কিছু না জেনেই তাদের অবজ্ঞা করতেন। তিনি চাষীদের "বর্বর বা অসভ্য" বলেছেন এবং কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বলেছেন "গ্রাম্য জীবনের নির্বুদ্ধিতা"র কথা। প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু ১৯৪৫ সনে গান্ধীজীকে লিখেছিলেন, "গ্রাম বলতে বোঝায় বুদ্ধিতে, সংস্কৃতিতে অনগ্রসর অঞ্চল। এই পেছিয়ে-থাকা অঞ্চলের উন্নতির কোন আশা করা যায় না। সঙ্কীর্ণমনা লোকেরাই মিথ্যাবাদী ও হিংসাপ্রিয় হয়।" শহরের অনেক শিক্ষিত লোকই পণ্ডিতজীর মতে সায় দেবেন।

এঁদের সঙ্গে আমিও একমত যে, গ্রামের লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধির দিকে অনগ্রসর এবং অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির দিকেও। কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া বা চীন

দেশের ইতিহাসের সাক্ষ্য বিশ্বাস করলে এটা মানা যায় না যে, "পেছিয়ে-থাকা দেশের উন্নতির কোন আশা করা যায় না।" আবার যুক্তির দিক দিয়ে বিচার করলে বোঝা যায় যে, অনগ্রসর স্থানেরই অগ্রগমন হওয়া সম্ভব, যা অগ্রগামী তার তো কোন সমস্যাই নেই। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সত্য উপলব্ধি করা যাবে। গান্ধীজীর সাতাশ বছরের স্বাধীনতার যুদ্ধে এই ভারতের গ্রামের চাষীরা কেমন করে হিংসা বর্জন করে দলে দলে যোগ দিয়েছিল তা ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, জওহরলালজীর উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তের সবটুকু সত্য নয়—অন্ততঃ তাদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তিনি ঠিক বলেননি।

চাষীর বুদ্ধি চলে একটু ধীরে, আবার তারা মনের কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। তারা তাদের বিদ্যার বাহাদুরী প্রচার না করলেও, তাদের যে দক্ষতা আছে তারই উপর দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সকল সভ্যতা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। চাষই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান ও হিতকারী পেশা। চাষীরা সহসা নূতন কিছু গ্রহণ করতে চায় না—এ দোষটা চিকিৎসকদেরও আছে। এই দুই দলেরই গোঁড়ামির কারণও অনেকটা এক। এরা কাজ করে জীবন্ত বস্তু নিয়ে। জীবিত বস্তুর গতিবিধি জটিল—তাদের অস্তিত্ব ও স্বাস্থ্য যে নিয়মে বজায় থাকে তাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল এবং জীবজগতে পরস্পরের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ হলেও আপাতদৃষ্টিতে সহজে ধরা পড়ে না। জল ফোটালে বাষ্প হয় আবার বাষ্প ঠাণ্ডা করলে জমে জল হয়—জড় জগতে এ নিয়ম সর্বক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু

জীবজগতের নিয়ম জড়জগতের মত এত সরল নয়। সেখানে কোন্ ক্রিয়াতে কী ফল হবে তা সব সময়ে বলা যায় না। তাই যারা জীবন্ত বস্তু নিয়ে কাজ করে তারা সাবধানে চলে—সহসা নূতন কিছু করতে চায় না, সে চাষীই হোক আর চিকিৎসকই হোক। এখন বিচার করে দেখা যাক চাষীদের জীবনযাত্রায় বা তাদের কাজকর্মে শ্রদ্ধার কিছু আছে কিনা। তাদের কাজের ব্যাপারটাই আগে পরীক্ষা করা যাক।

চাষী কাজ করে মাটিতে। মাটি কি মাত্র সেই ময়লা জিনিস, যা আমাদের শরীর, কাপড় ও ঘরবাড়ী থেকে সযত্নে দূর করতে হয়? এই মাটি, বিশেষ করে তার উপরের আট ইঞ্চি বা দশ ইঞ্চি জীবন্ত বস্তুর আবাসভূমি। একটা টাকার (আধুনিক) উপর যতটুকু মাটি ধরে, ততটুকু উর্বর মাটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, তাতে যত অতিসূক্ষ্ম জীবাণু রয়েছে, কলিকাতা, টোকিও বা নিউইয়র্ক শহরে তত মানুষ নেই। এই জীবাণুগুলি আছে বলেই মাটি হয়েছে উর্বর। এইসব সূক্ষ্মজীবের কেউ কেউ এমন অম্লরস নিঃসরণ করে যে, তাতে মাটি বা বালুকণা গলে উদ্ভিদের খাদ্যে রূপান্তরিত হয়। তৃণলতা, গাছ সেই রস শিকড় দিয়ে শুষে নিয়ে পুষ্ট হয়, ফল প্রসব করে—যা খেয়ে কীট-পতঙ্গ, পাখী, প্রাণী, মানুষ বেঁচে থাকে। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবাই এই আট-দশ ইঞ্চি মাটির জোরেই টিকে আছে ও বংশ বিস্তার করছে। এই মাটি শুধু গাছপালাকে দাঁড়াবার স্থান দেয়নি, তাদের বাঁচিয়ে রাখে। মাটি শুধু মাটি নয়—মা।

চাষীরা মানুষের অন্নবস্ত্র যোগাবার জন্য মাটিতে চাষ করে। এ কথা তো সবাই বলেন যে, যে যা করতে চায় তার উপায়ও তাকেই রচনা করতে হয়। কাজেই যদি অন্নবস্ত্র আমাদের আদরের জিনিস হয় তবে সেই অন্ন, সেই বস্ত্র যারা যোগায়—যারা চাষ করে তাদেরও সমাদর করতে হবে।

আমরা কিন্তু বলে থাকি চাষীরা অশিক্ষিত, বিজ্ঞানের কিছুই জানে না, কার্যকারণ সম্পর্ক বোঝে না, তাই তারা কোন সম্মানের যোগ্য নয়। হাতে কাজ করে যারা বাস্তব ফল ফলাচ্ছে, তারা ফল ফলাবার বিদ্যাটি কিছু জানে না এ কথা বলা কি ঠিক? আমরাও তো জানিনে। সুতরাং চাষী ও আমরা 'কিছু জানি না' এই উক্তি সংশোধন করে এটা বলা কি ভালো নয় যে, কৃষিবিদ্যার কার্যক্রমের বিশ্লেষণ করে তার সকল অংশের বৈজ্ঞানিক নামকরণ আমরা করতে পারিনি? মোটামুটিভাবে বলা যায়, কৃষিকার্য করতে গিয়ে চাষীকে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জড় ও জীবন্তের রসায়নশাস্ত্র, পদার্থ-বিদ্যা, আবহাওয়ার জ্ঞান, শারীরতত্ত্ব, পশুস্বাস্থ্যতত্ত্বের সাধারণ জ্ঞান, পশুখাদ্যের গুণাগুণ ইত্যাদির অনেকখানিই জানতে হয়। এই জ্ঞানের পরিমাণ সামান্য নয়। তবে তার জানা বিষয়গুলি সে সাজিয়ে গুছিয়ে বলবার মত করে তুলতে পারেনি, কিন্তু সে জানে আর শুধু জানেই না, এই জ্ঞানকে সে ক্রমাগতই কাজে লাগায়।

কোথা থেকে চাষী এই বিদ্যা শিখেছে—কলেজের শিক্ষক বা বৈজ্ঞানিকের কাছে তো তার শিক্ষা হয়নি। এই জ্ঞানের

কিছুটা সে পেয়েছে অতি প্রাচীন কৃষি-সংস্কার থেকে—যে জ্ঞান সংগ্রহ হয়েছিল সেই অতি প্রাচীন যুগে, যখন মানুষের সহজবোধ ছিল অনেক বেশী শক্তিশালী ; যখন মানুষ ও প্রকৃতির যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ ছিল—যার শক্তিতে বিনা যুক্তিতে মানুষ সংসারের স্বরূপ উপলব্ধি করে প্রকৃতির নিয়ম বুঝতে পারত। কৃষকের বিদ্যার আর এক ভাগ এসেছে বহু শতাব্দী ধরে লক্ষ্য করে, পরস্পর তুলনা করে, পরীক্ষা করে যে জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে সেই জ্ঞান থেকে। এই অভিজ্ঞতাগুলি নোট বইয়ে কেউ লিখে রাখেনি, বা এই পরীক্ষাগুলি গবেষণাগারে করে দেখাও হয়নি। কিন্তু এই পরীক্ষাগুলি হয়েছে কৃষিক্ষেত্রে এবং বহু যুগ ধরে হয়েছে। এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিরও অভাব ছিল না, বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে জ্ঞাত বস্তুর সংযোজনে উদ্দেশ্যসাধনের পরীক্ষা চলেছে —ফল বিচার করা হয়েছে সূক্ষ্মভাবে, বিচারে যা পাওয়া গিয়েছে তাকে বারবার প্রয়োগ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হয়েছে।

চাষীর বিদ্যার পরীক্ষায় তাদের একটি কাজের বিচার করে দেখা যাক—লাঙল দেওয়া বা চাষ করা। এই লাঙল চালানোর কাজেই কত বিচার, কত কৌশল রয়েছে। এই লাঙল চালানো সকল জমিতে, সকল ফসলের জন্য একরকম হতে পারে না। জমির প্রকারভেদে লাঙল চালানোরও রকম-ফের করতে হয়। কোন জমি কঠিন মেটেল, কোন জমি হালকা মেটেল, কোন জমিতে গাছপাতা পচা বেশী আছে

বলে নরম, কোথাও বা বালি বেশী। আবার এই কয় রকম মিলেমিশে আরও অনেক রকমের জমি হয়েছে।

কোন জমিতে উপরের চাষযোগ্য মাটি অগভীর আবার কোন জমিতে তা অনেক গভীর পর্যন্ত নেমেছে। এই মাটির নীচের স্তরেরও হিসাব রাখা দরকার—কোথাও তা কঠিন মেটেল, কোথাও কঙ্করময়, কোথাও বালি, কোথাও বা পাথর। জমির ঢালও চাষের পক্ষে বিশেষ বিচার্য। কোন জমি একদিকে ঢালু, কোনটি উঁচু-নীচু, কোনটি বা সমতল। ঢালু কোন্ দিকে তার উপর নির্ভর করে জমিতে কতটা তাপ সঞ্চার হবে, তা কি পরিমাণ রস (জল) ধরে রাখতে পারবে। জমি কতটা ঢালু, তার উপরের মাটির প্রকৃতি ও নীচের মাটির অবস্থা—এর উপর নির্ভর করে তার জল ধরে রাখার ক্ষমতা। কোন্ জমি নদী বা জলাশয়ের ধারে, কোন্টি বা জল থেকে অনেক দূরে—উপরি-উক্ত অবস্থাগুলির উপর নির্ভর করবে কোন্ অবস্থায় লাঙ্গল দিতে হবে, কত গভীর চাষ করতে হবে, কোন্ মুখে হাল চালাতে হবে। এমনও হতে পারে যে, ভিজে জমিতে চাষ দিয়ে জমি কয়েক বছরের মত নষ্ট হয়ে গেল। জমির রস বা বাত ঠিকমত হলে তবে লাঙল দেওয়া যেতে পারে। এই অবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সেই অঞ্চলের আবহাওয়ার সঙ্গে। ঢালু জমিতে ঢালের সঙ্গে যতটা পারা যায় আড়াআড়িভাবে চাষ করা উচিত। ঢাল বরাবর চাষ করলে মাটি ধুয়ে যাবে ও জমি অনুর্বর হয়ে যাবে। একই চাষীর রকমারি জমি থাকে। সব জমিতে সে একইভাবে

চাষ করতে পারে না। কখন্ চাষ করতে হবে, আর তা কেমন করে করতে হবে এর বিচারের মধ্যে অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, লক্ষ্য করার ও বিচার করার ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবিলম্বে কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই ব্যাপার সম্পন্ন করার মধ্যে কি গৌরবের কিছু নেই? যাদের এতটা করতে হয় তাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে আমরা কি কুণ্ঠিত হব?

চাষের কাজে ও চাষীর জীবনধারায় বিচারবুদ্ধি কতটা লাগে তা বোঝাবার জন্য, অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিজ্ঞান বাস্তব্যবিদ্যা বা ইকোলজি (Ecology) সম্বন্ধে কিছু বলব। ইকোলজি হচ্ছে সেই ধরনের বিজ্ঞান যার বিচার্য বিষয় হচ্ছে —জীবিত প্রাণীদের মধ্যে পরস্পরের নির্ভরতা ও সম্পর্ক। প্রত্যেক প্রাণীই অপর সকল প্রাণীর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল —কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য প্রাণীর মাধ্যমে। যেমন বাঘ, হরিণ ও গাছ। বাঘ বাঁচে হরিণের দেহ ভক্ষণ করে—হরিণ তৃণলতা, পাতা ভোজন করে। বাঘ হরিণকে মেরে গাছপালার বাঁচা সম্ভব করে—নচেৎ হরিণের সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে গেলে গাছপালা লোপ পেত, হরিণও আর আদৌ খাদ্য পেত না। সকল জীবিত প্রাণী পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত রয়েছে—অতি সূক্ষ্ম জীবাণু ও উদ্ভিদ্, কীট-পতঙ্গ, ঘাস, লতা, বৃক্ষ, সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী সকলেই পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্ব সম্ভব করেছে। এই সকলের অস্তিত্ব নির্ভর করছে এই সম্পর্ক বজায় থাকার উপর।

এই সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই সুদূরপ্রসারী, জটিল ও বিস্ময়কর। Encyclopaedia Britannica নামক ইংরাজী শব্দকোষ হতে সংগৃহীত একটি কাহিনী এই বিজ্ঞানের পরিচয় দেবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের তিন চার বছর পরে লণ্ডন শহরের দক্ষিণের অঞ্চলে দেখা গেল যে, সাদা ক্লোভার (white clover) জাতীয় ঘাস একেবারেই লোপ পেয়ে গেল। ইংলণ্ডে গোপালনের জন্য ঘাসের মাঠের খুবই প্রয়োজন, কাজেই এটাকে অবহেলা করা গেল না। কর্তৃপক্ষ এর জন্য ব্যস্ত হয়ে কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, কোন ব্যাধির আক্রমণে এটা ঘটেনি ; এও প্রমাণ হল যে, কোন বিশেষ জাতীয় কীটের উপদ্রবও ঘটেনি। কাজটা জরুরী বলে একজন ইকোলজি-বিশেষজ্ঞ (Ecologist) নিযুক্ত হলেন। কী করে এই বিশেষ জাতীয় ঘাস লোপ পেল তাই আবিষ্কার করা হল তাঁর কাজ। তিনি স্থানীয় অবস্থা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন ও সেই সঙ্গে সেখানকার সমুদয় বিবরণ সংগ্রহ করে জানতে পারলেন যে, সেখানে চাষ-আবাদের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। চাষীরা পূর্বে যে সব ফসল তৈরী করে লাভবান হত, যুদ্ধের বাজারে তার দাম কমে গিয়ে লাভ চলে গেল। তখন এই অঞ্চলের চাষীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল কী করলে তাদের ব্যবসায় বজায় থাকবে। তারা দেখল যে, লণ্ডন শহরে মুর্গীর মাংস ও ডিমের চাহিদা খুব বেড়ে গিয়েছে। মুর্গীর ব্যবসার সকল দিক বিবেচনা করে

লণ্ডন-ঘেঁষা এই অঞ্চলটি অন্য কাজ বন্ধ করে মুর্গীর চাষে মন দিল।

ব্যবসাটা তাদের কাছে নূতন বলেই বোধ হয় তারা প্রথমে বুঝতে পারেনি যে, লণ্ডনের লোক ছাড়া স্থানীয় বিড়ালরাও মুর্গীর মাংস খেতে খুব ভালোবাসে। যার জন্য সেখানকার বিড়াল এত মুর্গী খেতে আরম্ভ করল যে, তাদের নূতন ব্যবসায় সেখানেই থামবার উপক্রম হল। অনেক খরচপত্র করে তারা যখন দেখল যে তাদের সর্বনাশ হতে চলেছে, তখন সকলে মিলে স্থির করল যে, বাঁচতে হলে বিড়ালের মুর্গী খাওয়া বন্ধ করতেই হবে। অন্য উপায় না পেয়ে একদিন তারা এক-যোগে বিড়াল মারা আরম্ভ করল। ফলে সে অঞ্চলে আর বিড়ালই থাকল না।

Ecologist এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। চাষীরা মুর্গীর চাষ করে ব্যবসায় বেশ চালাতে লাগল। সাধারণ লোক লক্ষ্য না করলেও, বিবরণ সংগ্রহ করে Ecologist দেখতে পেলেন, বিড়ালের বংশ লোপ ও মুর্গীর চাষ বৃদ্ধি হয়ে ব্যাপারটা শেষ হল না। বিড়াল লোপ পাওয়ার ফলে মাঠের ইঁদুর অসম্ভব বেড়ে গেল। এতদিন বিড়াল ইঁদুর মেরে ইঁদুরের সংখ্যা কমিয়ে রাখত, এখন আর সে বাধা না থাকায় ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি অপরিমিত বেড়ে গেল।

ইঁদুর বাড়লেও ইঁদুরের খাবার বাড়ল না, কাজেই বাড়তি ইঁদুরগুলির জন্য খাবারের টানাটানি পড়ল। এখন এই জাতীয় ইঁদুরের একটা প্রিয় খাদ্য হচ্ছে বাম্বল্ বী (Bumble Bee)

নামক এক জাতীয় মৌমাছির ডিম ও মধু। এই মৌমাছিগুলি মাটিতে গর্ত করে তারই মধ্যে চাক গড়ে তাতে মধু সঞ্চয় করে ও ডিম পাড়ে।

কীটবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ Ecologist জানলেন যে, এই জাতীয় মৌমাছির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাদের আকারের স্থবিধার জন্য কেবল তারাই সাদা ক্লোভার ঘাসের সরু লম্বা ফুলের মধ্যে ঢুকে তা থেকে মধু সংগ্রহ করতে পারে—যা অন্য মৌমাছি পারে না। মধু সংগ্রহকালে ফুলের পরাগ তাদের গায়ে লেগে পুরুষ ফুল থেকে স্ত্রী ফুলে সঞ্চারিত হয়, যার ফলে ওই ঘাসের বীজ জন্মায়। এই জাতীয় ঘাসে দু' বছরে একবার ফুল ধরে, তারপর নতুন গাছকে জায়গা দেবার জন্য বীজ ঝরিয়ে ঘাস মরে যায়, আবার সেই বীজ থেকে নূতন ঘাস জন্মায়।

ইঁদুর বেড়ে যাওয়াতে বাম্বল্ বী জাতীয় মৌমাছিদের চাকের উপর আক্রমণ এতই বেড়ে গেল যে, তাদের বংশ লোপ পেল। ক্লোভার ঘাসের ফুল ফুটল, কিন্তু পরাগ সঞ্চার করিয়ে বীজ জন্মাবার জন্য বাম্বল্ বী নামক মৌমাছির প্রয়োজন ছিল—তাদের বংশ লোপ পাওয়ায় ঘাসের বীজ জন্মালো না, ফলে নূতন ঘাসও হল না।

এই যে খাদ্যাখাদ্য নির্বাচনের ফলে মুর্গী থেকে মৌমাছি, এমনকি ক্লোভার ঘাস পর্যন্ত সকলে বেঁচে পৃথিবীতে টিকে ছিল, বিড়াল মেরে ফেলার ফলে সেই সূত্র ছিন্ন হয়ে কত বিভ্রাট ঘটাল! মানুষ সাময়িক স্থবিধার জন্য যখন এই প্রাকৃতিক জীবনধারাকে ভিন্ন করে দিল তখন তার জানা

ছিল না যে তার ফল কত দূরপ্রসারী হবে। সূক্ষ্ম জীবাণু থেকে আরম্ভ করে সকল জীবিত প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে তার স্বরূপ খুবই জটিল ও বহুদূরপ্রসারী।

হিন্দু সংস্কার ও ধর্মনীতির মধ্যে এই ইকোলজি বিজ্ঞানের তত্ত্বের বহু প্রয়োগ লক্ষ্য করা যেতে পারে। হিন্দু ও জৈনশাস্ত্রে প্রাণীদের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কের বিষয়ে গভীর চেতনা লক্ষ্য করা যায়। প্রাণিহত্যার প্রতি হিন্দু ও জৈন মতাবলম্বীদের যে বিরূপ ভাব, এমনকি মানুষের ক্ষতিকর বাঁদর ছাড়া গরু, ছাগল, বিষধর সাপ, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীর বিষয়েও হত্যা না করার যে মনোভাব—পাশ্চাত্ত্য জাতিরা তাকে নির্বোধ কুসংস্কার বলে মনে করেন। ইকোলজি বিজ্ঞানের মতে, সমুদয় জীবের মধ্যে যে যোগসূত্র সকলকে রক্ষা করে, হিন্দু ও জৈনদের মনোভাবে সেই গভীর তত্ত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এর মধ্যে এই সত্যই স্বীকৃতি পায় যে, মানুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ জীব বলে ঘোষণা করলেও তার টিকে থাকার অধিকার অন্য প্রাণীর থেকে বেশী হবার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ থাকতে পারে না। বিজ্ঞানের মতে সকল জীবিত প্রাণীই পরস্পরের সহায়ক হয়ে বেঁচে থাকবে—এই সত্যের মধ্যে নগ্ন হিংসার কোন স্থান নেই।

এই সম্পর্কে Encyclopaedia Britannica নামক ইংরেজী শব্দকোষ থেকে নেওয়া আর একটি কাহিনী বলি।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে এক সময়ে নরওয়ের সমুদ্রতীরে এক বিশেষ জাতের বুনো হাঁসের প্রাচুর্য ছিল। হঠাৎ দেখা গেল, দু' বছরের মধ্যে কমতে কমতে ওই জাতীয় হাঁস একেবারে

বিলুপ্ত হয়ে গেল। অনুসন্ধান করে এটুকু জানা গেল যে, ওদের নূতন কোন সংক্রামক ব্যাধি হয়নি (যা অল্পস্বল্প ছিল তাতে তাদের সংখ্যা কমে যেত না) বা কোন নূতন শত্রুও দেখা দেয়নি। এই পাখীর পূর্ণ বিলোপ কী করে সম্ভব হল সন্ধান করার জন্য ইকোলজি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ এক বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত করা হল। বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার পর তিনি যে সিদ্ধান্ত করলেন তা বিস্ময়কর। তিনি আবিষ্কার করলেন যে, ওই জাতীয় হাঁস ছাড়া আরও এক-জাতীয় পাখী নরওয়ের সমুদ্রতীরে বাস করত। সেটা এক-জাতীয় বাজপাখী, যারা ওই হাঁস খেয়েই জীবন ধারণ করত। হাঁসগুলি ছিল বাজের চেয়ে দ্রুতগামী, কাজেই সুস্থ সবল হাঁসকে ওই বাজপাখী ধরতে পারত না। যে হাঁস অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে পুরো জোরে উড়তে পারত না তারাই বাজের শিকার হত। পরীক্ষায় জানা গেল, ওই হাঁসের দলে একরকম আমাশয় রোগ হত। যারা ওই রোগে আক্রান্ত হত তারাই দুর্বল হয়ে পড়ে বাজের কবলে মারা যেত। এজন্য ওই রোগটা ছোঁয়াচে হলেও হাঁসের দলে বেশী ছড়াতে পেত না। কাজেই হাঁসও ছিল, বাজপাখীও ছিল।

যে সময়ে ওই জাতীয় হাঁস লোপ পেল তার বছর দুই আগে ইউরোপের মেয়েদের পোশাকের একটা নতুন ফ্যাশান চালু হয়েছিল। হঠাৎ দেখা গেল, এক বিশেষ জাতের পাখীর পালক টুপিতে লাগানো একটা জনপ্রিয় ফ্যাশান হয়ে দাঁড়ালো। ওই পাখী হল নরওয়ের উপকূলে যে বাজপাখীর কথা বলা

হয়েছে সেই পাখী। ফ্যাশানের চাহিদা মেটাবার জন্য শিকারীরা অসংখ্য বাজপাখী মারতে থাকল; ফলে, ওই জাতীয় বাজপাখীর সংখ্যা গেল খুব কমে।

এদিকে বাজপাখী না থাকায় ওই হাঁসের দলের রুগ্ন হাঁসগুলি আর মারা পড়ল না। সেগুলি সুস্থ হাঁসের মত জোরে উড়তে না পারলেও কিছু বেশীক্ষণ উড়ে তারা দলের সঙ্গেই থাকত আর রাত্রে দলের মধ্যেই ঘুমোতো। ফলে, তাদের সেই সংক্রামক পেটের পীড়া বহু হাঁসের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। ওই রোগে ভুগে মরতে মরতে হাঁসের সংখ্যা কমতে লাগল, অবশেষে একেবারে লোপ পেল।

এক্ষেত্রে বাজপাখী আপাতদৃষ্টিতে হাঁসের শত্রুতা করলেও দেখা গেল, তাদের জন্যই হাঁসের দল টিকে ছিল—রুগ্ন হাঁস মেরে ফেলে তারা সুস্থ হাঁসগুলিকে দল বজায় রাখার সুযোগ করে দিচ্ছিল। ইকোলজি বিজ্ঞানের মতে জীবজগতের অস্তিত্ব বজায় রাখার এই একটা জটিল পন্থা। এমনও হতে পারে যে, মানুষেরও এমন রোগ আছে, যা রুগ্নদের সরিয়ে দিয়ে সুস্থ মানুষকে বাঁচিয়ে মনুষ্য প্রাণীকে রক্ষা করছে। এটা একটা 'হতে পারে' এমন কথা, এজন্য অবশ্য রোগ নিবারণ বা নিরাময়ের চেষ্টা থামাবার কোন কারণ নেই। এখানে নৈতিক বিচারের প্রশ্নও প্রবল। নৈতিক বিচারেও ইকোলজির স্থান রয়েছে।

হিন্দু ও জৈনদের মতে সকল জীবিত প্রাণীর মূল্যই সমান এবং পবিত্র, কিন্তু এই তত্ত্বের কোন বৈজ্ঞানিক বিচার ও

প্রয়োগ কোনদিনই হয়নি, যার ফলে এই মত বহু বিড়ম্বনা ঘটিয়েছে।

ইকোলজি বিজ্ঞান কেবল যে পশুর সঙ্গে পশুর বা প্রাণীর সঙ্গে পতঙ্গের সম্পর্ক বিচার করে তা নয়, মানুষের সঙ্গে উদ্ভিদের সম্পর্কও বিচার করে। পুরাকালে হিন্দুরা গরু ও গাছকে পূজা করেছে বটে, কিন্তু গাছের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ও তার মূল্য বিচারের চেষ্টা না করে প্রভূত ক্ষতি করেছে। John Stewart Collis-এর লিখিত 'Triumph of the Tree' বা 'বৃক্ষের মাহাত্ম্য' নামক বইয়ে আছে, "গাছ জমিকে শুধু ধরে রাখে না, তার আরও বহু উপকার করে। তাদের চারদিকের বাতাসকে ঠাণ্ডা করে, আকাশে জলকণা ছড়িয়ে মেঘ সৃষ্টি করে বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রিত করে, আবার তাদের গোড়ার চারিদিকের জল শুষে নিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণে প্রভূত কাজ করে। নদী ও ঝর্নাকে শাসন করে, মাছের মঙ্গলসাধন করে এবং নৌকা চলাচলেরও সাহায্য করে (যখন সংসারে মানুষ এল তখন) ; আর বহু বৃক্ষ মিলে জল শোষণ করে জল শুকিয়ে ফেলে ম্যালেরিয়া-বিস্তারী মশা বাড়তে দেয় না। প্রকৃতির কর্মনীতিতে গাছের কাজ সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।" এসব বিষয় তিনি বাস্তব দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মধ্যভারত ও ভারতের অন্যান্য স্থান ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। লোভের বশেই হোক আর অজ্ঞতার জন্যই হোক, অবহেলার জন্য হোক বা ব্যবসায়-বুদ্ধি থেকে হোক, সেই জঙ্গল কেটে ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে, আর বৃক্ষ রোপণ করা হয়নি। এর

ফলে ঘটেছে মৃত্তিকা হানি, তারই জন্য হয়েছে উর্বরতার অভাব। যখন মাটির সব-উপরের স্তর হতে তার ধাতব অংশ ও জীবাণুর দল ধুয়ে চলে যায় তখন ফসলের ফলনই শুধু কমে না, তাতে মানুষকে সুস্থ রাখার উপাদানও যায় কমে। যে মানুষ ও প্রাণী সেই ফসল খেয়ে বাঁচে তাদের রোগ-নিবারণ ক্ষমতা যায় কমে, অনেকে রুগ্নই হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্ত্যের স্বাস্থ্য-গবেষণা ও জৈব রসায়নশাস্ত্র আলোচনার ফলে বহু প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে যে, এই ধরনের পুষ্টিহীন খাদ্যের পরিণতি বিষময় আর মাটির অনুর্বরতার ফলেই এই অভাব ঘটছে। ভারতের অস্বাস্থ্য ও ব্যাধির জন্য যে ভারতের মাটিই দায়ী তা বোঝা যাচ্ছে।

ভারতের জঙ্গল নষ্ট করার ফলে আরও একটি দুর্ভাগ্য ঘটেছে, অন্ততঃ আংশিক ঘটেছে। জঙ্গলে বাঘ, চিতা ইত্যাদি মাংসাশী প্রাণী বাস করত। তারা খেত গবাদি পশু ও বনের হরিণ। এতে মনে করা যেতে পারে যে তারা মানুষের শত্রুতা করত। তা ঠিক নয়, গবাদি পশু কমিয়ে তারা অন্য সব প্রাণীর তুলনায় তাদের সমতা রক্ষা করত। যখন জঙ্গল লোপ পেল, মাংসাশী জন্তু-জানোয়ার অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হল। ফলে, গরু, ছাগল বিনা বাধায় সংখ্যায় বেড়ে চলল।

ভারত সরকারের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাবে ১৯৫১ সনে সারা ভারতে মোট ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ গবাদি পশু ছিল বলে জানা গিয়েছে। এর সঙ্গে ২৬ কোটি ৬০ লক্ষ একর চাষের জমির হিসাব ধরলে দেখা যায়, প্রতি একশত

একরে ৭৩টি গবাদি পশু ভারতে ছিল। ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় হিসাব করে বলেছেন, প্রতি একশ' একর চাষ করা জমির উপর সাতষট্টিটি পশু আছে। ওই সময়ে আর একটি বড় কৃষিপ্রধান দেশ চীনে প্রতি একশ' একরে ছিল পনেরটি— জাপানে ওই হিসাবে ছয়টি। ভারতে এই সব পশুর সংখ্যা এতই বেশী যে, এতে কি জমি, কি মানুষ কারো মঙ্গল হচ্ছে না। ইকোলজি বিজ্ঞান মতে এই সংখ্যা অত্যন্ত বেশী।

অবস্থা বিবেচনা করে এখন এ কথা বললে বোঝা যায় যে, প্রাকৃতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়, যদি মানুষ কোন বিশেষ জাতের প্রাণীকে বেশী সংখ্যায় নষ্ট করে—যেমন নরওয়েতে হাঁস মেরে, ভারতে বাঘ ও চিতা মেরে হয়েছে। আবার কোন বিশেষ প্রাণীকে রক্ষা ও পালন করে তাদের বংশবৃদ্ধি করার ফলেও সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়—তখন সেই পালিত জন্তু মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। গরু ইত্যাদি গৃহপালিত পশুকে পবিত্র মনে করে তাদের পালন করাতে তাদের সংখ্যা এখন মানুষের ক্ষতির কারণ হয়েছে। এখানে এমন হওয়া স্বাভাবিক, গরু ছাড়া অন্য জন্তুও তো পবিত্র মনে করা যেতে পারে। হয়তো অন্য প্রাণীরা তাদের দিক থেকে মানুষকে ক্ষতিকর মনে করে।

এই সব বিচারে বোঝা যায় যে, মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও সদসৎ বিচারের অভাব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি হতে দেখলে একটা বিচ্যুতি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ম্যালেরিয়ার বিষয় বিবেচনা করা যাক। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত

কোন রোগীর দেহ থেকে রোগ-জীবাণু সংগ্রহ করে সুস্থ লোককে দংশন করার সময়ে তার শরীরে সঞ্চারিত করে ম্যালেরিয়া রোগ। যদি গ্রামের লোকেরা ডোবা, গর্ত ভরাট করে জল আটকাতে না দেয় আর পুকুর বাঁধে, কৈ-খলিশা জাতীয় মাছ বেশী ছাড়ে আর না তুলে নেয়, তা হলে মশার ডিম পাড়ার জায়গা কমে যাবে এবং মাছে মশার বাচ্চা খেয়ে ফেলবে, ফলে মশা আর বাড়তে পারবে না। এই সব উপায়ে যদি মশা নষ্ট করে ফেলা যায় তা হলে ম্যালেরিয়াও চলে যাবে। জলাশয়ের কিনারায় কেরোসিন তেল ছড়িয়ে দিলেও মশার বাচ্চা নষ্ট হবে।

মশার ডিম নষ্ট করতে পারলে ম্যালেরিয়াও নষ্ট হবে। অবশ্য ছোট ছোট গর্তগুলি মাটি দিয়ে বোঁজানো ও জল জমতে না দেওয়া খুব ঝঞ্ঝাটের কাজ। কিন্তু ম্যালেরিয়া হওয়া তো কম বিপদ নয়। যদি গ্রামের লোক সবাই মিলে পয়সা দিয়ে দু'জন লোক নিযুক্ত করে ছোট ছোট গর্ত বুঁজিয়ে জল জমা বন্ধ করে, বড় জলাশয়ের ধারে ধারে কেরোসিন ছড়িয়ে মশার ডিম নষ্ট করে এবং পুকুরে কৈ ইত্যাদি মাছ ছেড়ে ম্যালেরিয়া দমন করতে পারে, তা হলে গ্রামের লোক ম্যালেরিয়া মুক্ত হয়ে সুস্থ দেহে অধিকতর খেটে বেশী ফসল ফলিয়ে অবস্থার উন্নতি করতে পারবে। এটা যদি বৈজ্ঞানিক সত্য হয় তা হলে এটাও বলা যেতে পারে যে, ইকোলজি শাস্ত্রের চর্চা না করা ও তার সিদ্ধান্ত অনুসারে না চলার জন্যই লোকে ম্যালেরিয়ায় ভোগে।

যদি কেউ বলেন যে, মশার আড্ডাতে ডি. ডি. টি. ছড়ালে তো মশা ধ্বংস করার কাজ অনেক সহজে হবে! আমি স্বীকার করছি যে, প্রথম প্রথম এর সাফল্য দেখে লোকে অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু এই প্রথার মুশকিল হচ্ছে যে, মশারা কিছুদিনের মধ্যেই ডি. ডি .টি. সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে, তখন আর ডি. ডি. টি. কাজ করে না। আরও বিবেচনা করার আছে যে, ডি. ডি. টি. শুধু মশার পক্ষেই বিষ নয়—মানুষের উপরও এর বিষক্রিয়া আছে। ডি. ডি. টি.র সূক্ষ্ম গুঁড়া উপর থেকে ও দেওয়াল থেকে ক্রমে নেমে এসে খাবারে মিশে যায়। মানুষের পেটে খাবারের সঙ্গে গিয়ে যকৃতে বাসা বাঁধে। ডি. ডি. টি.র সূক্ষ্ম গুঁড়া নিঃশ্বাসের সঙ্গেও শরীরে প্রবেশ করে। এর ফলে নানা রকমের কষ্ট ও অসুস্থতা ঘটে। এই বিষ শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে দীর্ঘ সময় লাগে।

বিষ ছড়িয়ে কীট-পতঙ্গ কমানো স্বাভাবিক উপায় নয়। শ্রেষ্ঠ উপায় হল—জীববিজ্ঞানসম্মত (Biological) উপায়-গুলি। ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ খেয়ে ফেলে এমন সব কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখী দিয়ে দমন করাটাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলে মনে হয়।

আবার এমন রোগ আছে, যেমন টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি পেটের সংক্রামক ব্যাধি—এগুলিকে মশা বা দূষিত জল বিস্তৃত করে। মাছি জন্মায় গবাদি পশু বা মানুষের মলে। গ্রামের লোক সাধারণতঃ মাঠে এমনকি পথের ধারে মলত্যাগ করে মাছির ডিম পাড়ার সুবিধা করে দেয়। প্রাচীন কালে ইহুদী জাতির মধ্যে একটি স্বাস্থ্যবিধি প্রচলিত ছিল যে,

মাঠে মলত্যাগ করতে যাওয়ার কালে তারা নিয়ে যেত এক ঘটি জল নয়, একটি ছোট কোদালী বা ওইরূপ যন্ত্র। ওই অস্ত্রের সাহায্যে মাঠে কোথাও একটি ছোট গর্ত করে সেই গর্তে মলত্যাগ করত—পরে খোঁড়া মাটি দিয়ে আবার ময়লা ঢেকে দিত। বেড়ালও ঠিক এই কাজ করে। এই অবস্থায় মলে মাছি ডিম পাড়তে পারে না, বরং মাটির জীবাণু ওই মল আক্রমণ করে তাকে ভালো সারে পরিণত করে রাখত। এতে দুর্গন্ধও নিবারণ হত, কোন অসুখও ছড়াত না।

এ কথা বললে ভুল হবে না যে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে লোকে মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে। ইকোলজি শাস্ত্র মেনে চললে তা তো হবেই, উপরন্তু এতে মানুষ এবং অপর সকল প্রাণীরই কল্যাণ হবে।

এই জটিল পরস্পর-সম্বন্ধবিশিষ্ট জীবনক্রিয়ার ব্যাপারের চর্চাই হচ্ছে চাষীদের কাজ। আমি এ কথা বলছিনে যে, তারা এই জীববিজ্ঞান রহস্যের সকল তত্ত্বই জেনে ফেলেছে, কিন্তু কাজের চেষ্টায় তারা যেটুকু জেনেছে তার ফলেই তারা জীবিত প্রাণী মাত্রকেই মূল্যবান মনে করতে শিখেছে, আরও বুঝেছে যে, সহসা এই জীবন ব্যাপারে কিছু বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়। যদি কেউ এই বাস্তব ক্ষেত্রের কাজে যোগ দিয়ে এই তত্ত্ব জানতে চেষ্টা করেন, তিনি বহু বিস্ময়কর তথ্য জেনে পরম আনন্দ লাভ করবেন এবং কৃষিতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিজ্ঞান গড়ে তুলতে পারবেন। বিশ্বব্যাপী এই যে জীবের কল্যাণলীলা, এটাই হচ্ছে গ্রামজীবনের আশ্রয়।

এ কথা সত্য যে, শোষণ, ঋণ, রোগ, অনাহার, কর্মহীনতা, অজ্ঞতা ও বহু বিপদ একযোগে গ্রামবাসীকে আক্রমণ করে— তাদের অনেকের চরিত্র নষ্ট এবং সৌন্দর্যবোধ ও আত্মসম্মান ধ্বংস করে জীবনে হতাশা এনে দিয়েছে। ক্ষতিটা যত বড়ই হোক না কেন, গ্রামের জীবনের গভীরে যে মহত্ত্ব, যে সৌন্দর্য বাসা বেঁধে আছে তাকে জাগিয়ে তোলার সম্ভাবনা আজও বিলুপ্ত হয়নি। ধৈর্যের সঙ্গে সাধনা করলে আজও গ্রামীণ জীবনের চেতনা ও সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে পৃথিবীকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করতে পারে।

সকলেই জানেন গান্ধীজীর নিকটতম শিষ্য বিনোবাজী হাজার হাজার গ্রাম, গ্রামদানের দ্বারা গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এতে তাদের ভূমির সমস্যা, ঋণের সমস্যা সব কিছুতেই তাদেরই পূর্ণ কর্তৃত্ব ঘটেছে। এমন কর্তৃত্ব যখন তাদের হাতেই এসেছে, অগ্রগতির যত সমস্যা আছে তাও তারা সমাধান করতে পারবে।

গভর্নমেণ্টের পক্ষে এত বড় কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ভারতের বহু সহস্র গ্রামে বহু কোটি সমস্যা রয়েছে। সরকারের কেন্দ্রীভূত শক্তির পক্ষে এর সমাধান করা সম্ভব নয়—গ্রামে গ্রামে বিকেন্দ্রিত শক্তির সঞ্চার করে প্রতিটি গ্রামকে তার নিজের গতি সাধন করতে হবে। কোন বিশেষ লোকের বা কোন প্রতিষ্ঠানের সাধ্য নেই গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে এই কাজ করে দেওয়া। যদি তা করা সম্ভবও হত তাতে কেবল গ্রামবাসীর চরিত্র ও আত্মসম্মান নষ্ট হত মাত্র। তাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে গ্রামবাসীদের নিজের কাজ নিজে করতে সাহায্য করা। এই অবনতির গভীর কূপ থেকে উঠবার চেষ্টাতেই তারা যে শক্তি অর্জন করবে তাতেই তারা নিজেদের উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারবে।

কোন্ পথে গেলে তারা ফল লাভ করতে পারবে? গান্ধীজী যে পথে নিজে চলে দেখিয়েছেন সেই পথই শ্রেষ্ঠ পথ। গান্ধীজী যেমন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে ভারত-বাসীদের নিজেদের সৌভাগ্য গঠনের অধিকার এনে দিয়েছেন —তেমনি বিনোবাজী গ্রামকে সহস্র বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে

তাদের অগ্রগমন সম্ভব করে দিয়েছেন। গ্রামদান হলেই গ্রাম স্বাধীন হল মনে করলে ভুল হবে—এখন তাঁর অনুগামী কর্মীদের অনেক কিছু করার রয়েছে। এগিয়ে যাবে গ্রামের লোক—এগোবার পথ ও উপায় হচ্ছে গান্ধীজী প্রদর্শিত খাদি প্রমুখ সতেরো দফা কার্যধারা, গ্রামদানের পরেই যেটা সম্পূর্ণ চালু করা সম্ভব হবে। এইভাবে গান্ধীজী ও বিনোবাজী উভয়ের কর্মধারা পরস্পরকে এগিয়ে দিচ্ছে।

খাদি-শিল্পের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হচ্ছে গ্রামীণ জীবনের এই দুর্গত অবস্থাতেও তা আরম্ভ করার কোন বাধা নেই। এর জন্য যা যন্ত্রপাতি দরকার তা দরিদ্রতম ব্যক্তির পক্ষেও অসাধ্য নয়, শিল্পের কৌশলও বেশ সোজা। এই রকম শিল্প এই অধঃপতিত গ্রাম্য সমাজেও চলবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এর প্রতিটি জিনিস গ্রামেই জন্মানো যায় আর এর ফল অতি সহজেই হাতের কাছে পাওয়া যায়—প্রত্যয় জন্মাতে দেরী হয় না। এর সরল কর্মপদ্ধতিতে গ্রামের লোককে দেবে গ্রাম-স্বরাজের কাজে দীক্ষা।

ইউরোপ আমেরিকার শিল্পকুশলতা ও শ্রীবৃদ্ধির বাহ্য রূপ দেখে যদি মনে হয় যে তাদের নকল করলেই আমাদের কল্যাণ হবে, তা হলে তাঁদের আমি আমার বই 'A Philosophy of Indian Economic Development' (ভারতের আর্থিক উন্নতির তত্ত্ববিচার) পড়তে অনুরোধ করি। এই বিষয়টার এত দিক আছে আর এর এত রকমের শাখা-প্রশাখা আছে যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে তার উল্লেখ

করাও সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করলেও, পুঁজিবাদের পথে, সমাজতন্ত্রবাদের পথে বা সর্বগ্রাসী কম্যুনিস্টতন্ত্রের আশ্রয় নিয়ে যদি এই শিল্পীকরণের পথ অবলম্বন করা যায়, তাতে আমাদের যথার্থ কল্যাণ ঘটাবে না। গান্ধীজী প্রদর্শিত স্বাধীনতার সাধনাই যে আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পথ তা বিচার করেছি আমার 'Which Way Lies Hope' (কোন্ পথে কল্যাণ হবে) নামক পুস্তকে।

যাঁরা মনে করেন ভারতের এই দ্রুত বর্ধমান জনসংখ্যার আহার যোগানোর জন্য অধিকতর রাসায়নিক সার ও বহুল পরিমাণে ট্র্যাক্টর ইত্যাদির ব্যবহার প্রয়োজন তাঁদের আমি বলব যে, তাঁরা ভারতের কৃষকদের অবস্থা ও তাদের মনোভাব কিছুই বোঝার চেষ্টা করেননি।

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে গাছও বাড়ে ফসলও বাড়ে। কিন্তু ওই সঙ্গে যদি যথেষ্ট পরিমাণে জৈবসার (পচানো অবস্থায়), পাঁক ইত্যাদি প্রয়োগ না করা যায় তা হলে ওই রাসায়নিক সার ফসলের খাদ্যগুণ অনেক পরিমাণে নষ্ট করে। অন্য কোন সার না দিয়ে কেবল রাসায়নিক সারে জন্মানো ফসল, তরিতরকারী ও ফল জৈব রসায়ন মতে সাবধানে পরীক্ষা করে জানা গিয়েছে যে, এই সার ব্যবহারে ফসলের প্রোটিনের (বা ছানাজাতীয় উপাদানের) গুণ অনেক কমে যায়। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে উপাদান হিসাবে ১৮ হতে ২১ রকমের এ্যামিনো এ্যাসিড (Amino Acid) থাকে। এর মধ্যে কয়েকটি প্রাণীর

শরীর রক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। রাসায়নিক সার মাত্র ব্যবহার করে যে ফসল জন্মায় তার প্রোটিনের মধ্যে বিভিন্ন এ্যামিনো এ্যাসিড যে যে ভাগে থাকা দরকার তার কম-বেশী হয়ে যায়। কখনও কখনও এমনও দেখা যায় যে, প্রাণিদেহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এ্যামিনো এ্যাসিডগুলি আদৌ নাই —অনেক সময়ে থাকলেও খুবই কম থাকে, অন্যান্যগুলিও স্বাভাবিক থাকে না। অনেক সময় এই খাদ্যে খাদ্যপ্রাণ (Vitamins) পরিমাণে অনেক কম থাকে।

এতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কেবল রাসায়নিক সারের সাহায্যে ফসলের পরিমাণ বাড়ানো গেলেও তার পুষ্টিকারিতা অনেক কমে যায়। আর এই রকম ফসল জৈবসারের সাহায্যে জন্মানো ফসল থেকে অনেক বেশী তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। কেবল রাসায়নিক সারে জন্মানো ফসলের গাছগুলি হয় দুর্বল, যার ফলে বাতাস লাগলেই সে গাছ শুয়ে পড়ে আর তার জন্য ফসল কাটতে অসুবিধা হয়। কেবল রাসায়নিক সারে জন্মানো ফসলে পোকা ও রোগ অনেক বেশী আক্রমণ করে। পোকা ও রোগ থেকে রক্ষা করবার জন্য চাষীকে আবার যন্ত্র ও ঔষধ বা বিষ কিনতে হয়, তাতে লাভ যায় কমে। ওষুধ বা বিষ দেওয়া মাঠে গরু চরে অসুস্থ হয় আর বিষাক্ত ঔষধ দেওয়া ফসলে মানুষের ক্ষতি করে। এই সব অবস্থা পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, কেবল রাসায়নিক সার ব্যবহারে ভারতে খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না।

গত ১৯৫৮ সনে যখন আমি ভারতের এক সংবাদপত্রে এই

সব কথা সাধারণের জ্ঞাতার্থে লিখেছিলাম তখন জৈব পচানো সারের সুবিধার কথাও লিখেছিলাম। সেই সময়ে ভারতের রাসায়নিক সার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এক কৃষি-বিশেষজ্ঞ ও অন্য একজন কর্মী আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন, "জমিতে জৈবসার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য আমরা সর্বদাই স্বীকার করি।" আমি বলেছিলাম, "ভারতে এমন কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান নেই যারা জৈবসার চাষীদের বিক্রয় করে লাভ করে। কিন্তু চাষীদের কাছে রাসায়নিক সার বিক্রয় করে লাভ করার জন্য অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। তাঁরা সকলেই রাসায়নিক সারের মাহাত্ম্য ও গুণ বর্ণনা করেন—উদ্দেশ্য, প্রচার চালিয়ে চাষীদের রাসায়নিক সার কেনাবেন। কিন্তু জৈবসার তৈরী করা ও জমিতে তা ব্যবহার করার কথা বলবার কেউই হয়তো নেই। যার জন্য জমিরও ক্ষতি হবে, চাষীরও হবে লোকসান। কৃষি-বিশেষজ্ঞ কিছুই বলেননি, এর উত্তরে কিন্তু বাজার-বিশেষজ্ঞ হেসেছিলেন।

চাষী জেনে শুনে তার জমিতে যথেষ্ট গোবর কেন দেয় না সেটা বিচার করা দরকার। ভারতের সমতল প্রদেশে সব জঙ্গলই কেটে ফেলা হয়েছে। কয়লার দাম চাষীর পক্ষে অত্যন্ত বেশী, আবার গ্রামে প্রয়োজনমত কয়লা পাঠানোর মত যথেষ্ট পরিবহণ ব্যবস্থা নেই। ফলে, চাষীর প্রয়োজন-মত কয়লা পাওয়ার উপায় নেই। এই জন্য ঘুঁটে তৈরী করে পোড়ানো ছাড়া চাষীদের গত্যন্তর নেই। এই কারণে গোবর মাঠে পৌঁছয় না, ফলে জমির উর্বরতা ক্রমাগত কমতে থাকছে

আর ভূমিক্ষয়ও বাড়তে থাকছে। চাষীরা সবই জানে, গোবর বাঁচাতে পারলে তারা জমিতে নিশ্চয়ই দেবে।

এই কার্যকারণের সংঘর্ষ অতি জটিল ও প্রতিকূল। গাছ-পালার জ্বালানির অভাব আছে তো বটেই, তার উপর এত বাজে গরু, ছাগল চারদিকে ঘুরে বেড়ায় যে যদি বা দু' চারটা গাছ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, তাকে খেয়ে শেষ করে দিচ্ছে।

এ কথা সবাই জানে যে, ভারতবাসীর কাছে গরু পবিত্র জন্তু—তাকে মেরে ফেলার কথা উঠতেই পারে না। এই মনোভাব এতই প্রবল যে, যদি কোন শক্ত লোক, যিনি গরুকে এত পবিত্র মনে করেন না, কৃষিমন্ত্রী হন, তিনিও প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে প্রয়োজনাতিরিক্ত গরু নষ্ট করতে পারবেন না। যদি বা তিনি দুঃসাহস বশতঃ বাড়তি গরু নষ্ট করে সংখ্যা কমিয়ে দেন তবে আর এক বিপদ দেখা দেবে—গোবরের অভাবে জ্বালানি হবে না, ফলে অনেক লোক রান্নার অভাবে খেতেই পাবে না। গরু, মহিষ কমাবার একমাত্র পন্থা হচ্ছে বাজে যাঁড়গুলোকে খাসী করে দেওয়া। এতে কারো বিশেষ আপত্তির কারণ নেই। এ প্রথায় ধীরে ধীরে গরুর সংখ্যা কমে আসবে। তাতে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হবে। গরুর সংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানির পরিমাণও কমবে, কারণ গোবর যাবে কমে। এদিকে দেশে লোকসংখ্যা বেড়েই চলেছে—রান্না করার ব্যাপারেও সেই জন্য জ্বালানির সমস্যা আকারে বাড়তে থাকছে, কাজেই সমস্যা রয়েই যাচ্ছে।

এই দুষ্ট-চক্র কোথায় ছিন্ন করা উচিত তাই এখন বিবেচনা

করতে হবে। আমার বিবেচনায়, যেখানে এই সমস্যার উদ্ভব সেখানেই সংশোধন করতে হবে। চীনদেশের মত এদেশেও জঙ্গল বাড়াতে হবে। প্রত্যেক গ্রামেই গাছ লাগাবার চেষ্টা করতে হবে। গরু, ছাগলের আক্রমণ আটকাবার জন্য কাঁটার বেড়া দিতে হবে। অনেক কাঁটাগাছ একত্র করে এ কাজ সম্ভব। যদি কেউ পারেন তবে পুরো ইট ফাঁক ফাঁক করে সাজিয়ে বেড়া তৈরী করলে আরও ভালো হয়। প্রত্যেক চাষীই ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু গাছ লাগাতে পারেন। আবার যদি সম্ভব হয়, তা হলে গ্রামের সকলে মিলে কাছা-কাছি কোন জায়গা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে গাছের চাষ করতে পারেন এবং সমবেত ভাবে তার পাহারার ব্যবস্থা করতে পারেন।

জ্বালানির অভাব এত বেশী যে, খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে এমন সব গাছ পোঁতা দরকার। বাংলাদেশের আবহাওয়া বিচার করে যে গাছগুলি হতে পারে উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানে তাদের নাম Cassia Siamia, Cassia nodosa (এ দুয়েরই বাংলা নাম হয়েছে সিন্‌জিরি) ও Eucalyptus Citriodora—ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ তো অনেকেই জানেন। এ ছাড়া দেশী গাছ বাবলা ও শিরিষ বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ে। এর মধ্যে সিন্‌জিরি গাছগুলি নোনা জমিতেও বেশ জন্মায়।* এও জানা গিয়েছে (সরকারী বনবিদ্যাবিশারদদের কাছ থেকে) যে,

* গাছের নামগুলি বাংলার বনবিভাগের পরামর্শ নিয়ে কিছু বদল ও কিছু যোগ করা হল।—অনুবাদক

এই গাছগুলিতে চার বছরেই বেশ কিছুটা জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়।*

ইউক্যালিপ্টাস গাছ চিরতে বেশ সুবিধা। যদি কোন গ্রাম তাদের প্রয়োজন হিসাব করে তার কয়েক গুণ অধিক গাছ লাগায় ও চার বছর পর হতে গাছ কাটতে আরম্ভ করে একটি গাছ কাটলেই তার জায়গায় আর একটি গাছ রোপণ করে, তা হলে গ্রামে কাঠের অভাব হবে না। বছরের পর বছর গাছও কাটা পড়বে আবার নতুন চারাও বাড়তে থাকবে। গাছের ডালপালা ও শিকড় মাটির ক্ষয় প্রতিরোধ করবে। যেখানে পাহাড় আছে সেখানে পাহাড়ের গায়ে, যেখানে কোন ফসল হয় না সেখানে এই রকম জঙ্গল করা খুব সুবিধা। অবশ্য প্রত্যেক গ্রামেই কয়েকজন লোক নিযুক্ত করে এই জঙ্গলের খবরদারী করাতে হবে। তারা কোন্ গাছ কাটা হবে তা ঠিক করবে, নূতন গাছ লাগাতে থাকবে এবং গ্রামের সম্পত্তি এই জঙ্গল অনিয়মিত কেউ যেন কেটে নষ্ট না করে তার ব্যবস্থা করবে।

জ্বালানির ব্যবস্থা হলেই গোবর পাওয়া যাবে। কিন্তু শুধু গোবর মাঠে দিয়ে যেটুকু উর্বরতা বাড়বে তার চেয়ে বেশী কিছু ওই গোবর দিয়ে করা যায় কিনা তাও ভেবে দেখা দরকার। অল্প গোবরের সাহায্যে অধিকতর মূল্যবান পরিমাণে অনেকগুণ বেশী সার পাওয়ার উপায় হল 'কম্পোস্ট' বা পচানো সার তৈরী করা। শুকনোর সময় এ সার

* এই গাছগুলি পুরা বড় হতে দশ থেকে পনের বছর সময় লাগে।

করতে সমান মাটিতে এক-দেড় হাত গভীর মেঝে কেটে নিতে হবে—চওড়া হবে ৬।৭ হাত লম্বা প্রয়োজনমত। এর মধ্যে দিতে হবে পরিত্যক্ত খড়, পাতা, ঝোপ-ঝাড়, বাড়ী-ঝাঁট-দেওয়া জিনিস, গোবর আর গরুর প্রস্রাবে ভেজা গোয়ালের মাটি। আর গর্তের এক প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে প্রথমে খড়, পাতা ইত্যাদি তিন আঙ্গুল মোটা করে বিছিয়ে যেতে হবে। এগুলো বেশ করে ভিজিয়ে দিয়ে তার উপর দু-আঙ্গুল মোটা করে গুঁড়ো মাটি বিছাতে হবে—সেটাও জল দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া দরকার। এই মাটির উপরে দু' আঙ্গুল মোটা করে গোবর বিছিয়ে দিতে হবে, তার উপর আবার পাতা, খড়ের স্তর বিছাতে হবে। আবার পূর্ববৎ স্তরের পর স্তর সাজিয়ে যেতে হবে, তবে সব কিছু বেশ ভিজা থাকা চাই। এই সারে ছাইও কাজে লাগে তবে গোবরের উপর ছাই দেওয়া উচিত নয়, কারণ ছাই গোবরের অনেক গুণ নষ্ট করে দেয়। এই রকম স্তর সাজিয়ে গাদাটা যখন পাশের জমির সমান হয়ে যায় তখন আর কিছু না দিয়ে গাদাটিকে বেশ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। প্রয়োজন বুঝে দুই তিন দিন অন্তর এই সার গাদাতে জল ছড়াতে হবে।

ঠিক মত তৈরী করে সার গাদা ভিজিয়ে রাখতে পারলে মাটি ও গোবরে যত জীবাণু ছিল তারা খুবই বাড়তে থাকে—গাদা গরম করে সব কিছু গরমে রাখার জন্য গাছপাতার মধ্যে যে বীজ ছিল বা মাছির ডিম, যা গোবরের সঙ্গে থাকে, সব নষ্ট হয়ে যায়—পাতাও পচে যায় ও খুব ভালো সারে

পরিণত হয়। এই ব্যাপারটা ঘটতে প্রায় তিন মাস সময় লাগে। এর মধ্যে, এক বা দেড় মাস পরে, ওই সার গাদাটি উল্টে দিতে পারলে খুবই ভালো হয়—এতে যেটা উপরে ছিল সেটা নীচে যায় আর নীচেরটা উপরে আসে।

বর্ষাতে এই ব্যবস্থা করলে গর্ত জলে ভেসে যাবে—সে সময় উঁচু জমির উপর এই সার গাদা রচনা করে এক বা দেড় হাত উঁচু পর্যন্ত ওঠা চলে—এ সময় জলও কম লাগে।

এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এত ব্যাপার না করে ওই জিনিসগুলি সোজাসুজি একেবারে জমিতে ছড়িয়ে বা চাষ করে দিলেই তো হত—প্রাকৃতিক নিয়মে সবকিছু পচে মাটির সঙ্গে মিশে যেত।

এর উত্তরটা জানা দরকার। এই জিনিসগুলি একসঙ্গে পচিয়ে মাঠে না দিয়ে আলাদা আলাদা ছড়িয়ে দিলে বা চষে দিলে এরা মিশে পচে যে অবস্থায় আসত তেমন ভাবে মিশতে পারে না—তার আরও কারণ, মাঠে তো এদের ভিজে অবস্থায় রাখা সম্ভব নয়। সেখানে সারের বস্তুগুলি থেকে কম্পোস্টের সারের মত জিনিস পাওয়াই সম্ভব নয়। মাঠে পাতা, গোবর ইত্যাদির পচনক্রিয়া অতি ধীরে ধীরে হয়। আরও অসুবিধা এই যে, মাঠের মাটিতে যে সব জীবাণু বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে, তারা যেই এই সব পাতা, গোবর ইত্যাদি মাটিতে পাবে তখনই তারা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নেওয়া বন্ধ করে এই সব বস্তুকে নাইট্রোজেনবাহী

সারে পরিণত করতে লেগে যাবে। যতক্ষণ এই কাজ শেষ না হবে, ওই সব জীবাণুরা ততক্ষণ আকাশ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করবে না—যার ফলে জমির নাইট্রোজেন যতটা জমতে পারত তা বন্ধ হয়ে যাবে। এই জন্য না-পচানো সার ছড়ানোর পরেই যে ফসল মাটিতে লাগানো হবে তারা নাইট্রোজেন-বঞ্চিত হয়ে তেমন বাড়বে না। যদি সারগুলি অন্যত্র পচিয়ে মাঠে দেওয়া হয় তা হলে জমিতে নাইট্রোজেন সংগ্রহের কাজ বন্ধ হয় না এবং যে সার মাটিতে দেওয়া হবে তাও ফসল সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে।

গ্রামের ও আশপাশের বাজে ষাঁড়গুলিকে খাসী করিয়ে বলদ খাটিয়ে কাজ পাওয়া যাবে। প্রতিটি গ্রামের জন্য একটি বা দুটি ভালো জাতের ষাঁড় রাখলেই যথেষ্ট হবে। রুগ্ন বা অক্ষম গাইগুলিকে গাভীন হতে না দিয়ে ভালো গাইয়েরই বাচ্চা হতে দেওয়া উচিত। যদি সম্ভব হয় বাজে গাইয়ের আলাদা খোঁয়াড় করে তাদের গোবর সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু নামমাত্র দুধের জন্য তাদের বাচ্চা হতে দিয়ে গরুর জাত নষ্ট করা ঠিক হবে না। এজন্য ষাঁড়কে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াতে না দেওয়াই ভালো। এই উপায়ে গরুর প্রতি ভক্তি বজায় রেখেও হিন্দুরা বাজে গরু কমিয়ে ফেলতে পারে। যার জন্য তাদের ফসলও বাঁচবে, দুধও বাড়বে। এই উপায়ে ছাগলের সংখ্যাও কমিয়ে দেওয়া যায়। ছাগলে অকেজো লতাপাতা খায় বলে তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে বড় গাছের চারা ও ফসল নষ্ট করতে দেওয়া ঠিক নয়। বাজে গাছ, পাতা

কম্পোস্টে ব্যবহার করলে তা দিয়ে জমির উর্বরতা বাড়ানো সম্ভব হবে।

গাছপালা, গোবর ইত্যাদি কাজে লাগাবার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে ইঁদুরের সংখ্যা কমানো ও শস্যাদি তাদের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা দরকার। গরু-ছাগলের সংখ্যা কমানোর মত ইঁদুরের সংখ্যা কমানোর কোন উপায় উদ্ভাবন করা আমাদের কাজ। সারা ভারতের হিসাব ধরলে ইঁদুরে লক্ষ লক্ষ মণ মানুষের খাবার খেয়ে ফেলছে। তার উপর আবার প্লেগের মত মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি মানুষের মধ্যে ছড়াচ্ছে। ভারতীয় অহিংস প্রথায় এমন কোন উপায় উদ্ভাবন করা দরকার, যাতে ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি না হয় আর তারা মানুষের খাবার নষ্ট করতে না পারে। এই সকল বিষয় বিচার করলে হয়তো প্রত্যয় জন্মাতে পারে যে, চাষের কাজের মধ্যে বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রভূত ক্ষেত্র বর্তমান রয়েছে। চাষের কাজ যে মূর্খের কাজ নয়, এর প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞান, বিচার ও বুদ্ধির অনন্ত বিকাশের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এ ধারণা জন্মাবার জন্য বোধহয় আর বেশীকিছু বলার প্রয়োজন হবে না। এতৎসত্ত্বেও শারীরিক মেহনতের প্রতি বিরাগ বশতঃ হয়তো এ কাজের প্রতি কারো কারো মনে শ্রদ্ধা না আসতে পারে। হয়তো মনে হবে যে, যে লোক দস্তুরমত শারীরিক পরিশ্রমে লিপ্ত থাকে সে অভিজাত বংশের লোকের তুলনায় নিম্ন শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত।

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, শূদ্র ছাড়া অন্য উচ্চ বর্ণের

লোকদের মনে শরীরশ্রমের প্রতি এই বিরাগ বহুকালের সংস্কারে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গিয়েছে। হয়তো এই জাতিভেদ প্রথা বহু শতাব্দী ধরে ভারতীয় সভ্যতাকে রক্ষা করে এসেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ভারত তথা পৃথিবীর বহু দেশ যে বিরাট্ পরিবর্তন বা ক্রান্তির সম্মুখীন হয়েছে, তার জন্য সামাজিক,অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই চিন্তাধারাকে নূতন করে সাজিয়ে নূতন পথে চলবার শক্তি অর্জন করতে হচ্ছে। ভারতের অধিকাংশ তরুণ এই ক্রান্তিতে যোগ দিতে চাইছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান ভারতের প্রাচীন জাতিভেদ নীতির পরিবর্তন সাধন করেছে। এমন হতে পারে যে, অনেক স্থানে লোকাচার কিছুটা পেছিয়ে আছে।

যদি আমরা আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক যন্ত্রশিল্পকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যেতে চাই তা হলে শরীরশ্রমের প্রতি বিরূপতা ত্যাগ করতে হবে। আর এ ধারণা ত্যাগ করতে হবে যে, শরীরশ্রম (কোন অজ্ঞাত কারণে) অপমানজনক। যে সব ভারতীয় ছাত্র ইউরোপ, আমেরিকায় শিক্ষা পেয়েছে তারা জানে যে, সেই দেশে বিজ্ঞানের ছাত্রকে, বিশেষতঃ যন্ত্রশিল্পের ছাত্রকে তাদের শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে শরীরশ্রম করতে হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রীতি হচ্ছে, প্রত্যেকেই কোন-না-কোন রকমের শরীরশ্রম করে। যদি কারো দৈনন্দিন পেশাতে শরীরশ্রমের প্রয়োজন না হয় তা হলে বাড়ীতে একটু ব্যবস্থা করে এটা-সেটা তৈরী করে শ্রম সাধন করে। অনেকে বাড়ীতে বাগানে মাটি কুপিয়ে গাছ লাগিয়ে এই শ্রম করে থাকে।

ভারতের ধ্যানী-জ্ঞানী নেতা গান্ধীজী বলেছেন যে, ভারত ও হিন্দুধর্মকে বাঁচতে হলে জাতিভেদ প্রথার বিলোপ সাধন অনিবার্য। গণতন্ত্র ও লোকতন্ত্র এই প্রথার অবসান চায়। নিজের হাতে কাজ করার জোরে অনেক নৈতিক ও মানসিক উন্নতি ঘটে। আমার 'A Philosophy of Indian Economic Development' (ভারতের আর্থিক উন্নতির বিচার) নামক পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যদি কেউ গ্রামে কাজ করার বিষয় চিন্তা করেন তাঁকে আমি সেই বইটি পড়ে নিতে অনুরোধ করব। তাতে অন্ততঃ এটুকু লাভ হবে যে, কৃষিজীবী নিজের হাতে কাজ করে বলে তার স্থান সমাজে কোন লোকের তুলনায় নীচের নয় এ বিশ্বাস করার বাধা ঘুচে যাবে।

এটা বাস্তব সত্য যে, গ্রামের লোক বুদ্ধিতে বা কলাবিদ্যায় তারা যা হতে পারত তা থেকে অনেক পেছিয়ে আছে। এ বিষয়ে উন্নতির উপায় কি ?

এর প্রথম উপায় হল, প্রতি গ্রামে গান্ধীনীতি অনুযায়ী একটি করে বুনিয়াদী বিদ্যালয় গঠন করা, যার শিক্ষক হবেন এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত ও বিশ্বাসী ব্যক্তি। বয়স্কদের জন্য খদ্দর তৈরী, জ্বালানি কাঠের জন্য বৃক্ষরোপণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ, যত্ন করে কম্পোস্ট সার তৈরী করা—যার পরিমাণ বাড়তেই থাকবে—এইসব হবে তাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। গ্রামে গ্রামে যাত্রা, অভিনয়, গানের দল গড়ে তোলা বুদ্ধির কাজ হবে। হিন্দুপুরাণ অবলম্বন করে নাটক রচনা করাই

সুবিধা। যেখানে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশী, সেখানে অন্য ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হতে পারে।

গ্রামে নিয়মিত রামায়ণ, মহাভারত পাঠ অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন করে সকলে সমবেত হয়ে অনেক সপ্তাহ ধরে চালাতে পারলে মঙ্গল হবে। এইসব কাহিনীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গভীর তত্ত্বগুলি মানুষকে উন্নত করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ার চেয়ে এই মহাকাব্য পড়ে বেশী লাভ হবে। যারা এই দুই মহাকাব্যের সঙ্গে সুপরিচিত হয়েছে তারা লিখতে পড়তে না জানলেও আমি তাদের শিক্ষিত মনে করি।

যেখানে গান্ধীজী ও বিনোবাজীর আদর্শ ও ভাবধারাকে সর্বাঙ্গীণ বিকশিত করে তুলতে হবে সেখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বড় করে জাগিয়ে তুলতে না পারলে কিছুই হল না মনে করতে হবে।

বুদ্ধিগত উন্নতির ক্ষেত্রেও, বুনিয়াদী শিক্ষার নীতির উপর ভিত্তি করে চাষের উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, পশুপালনের উন্নতির পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব বিজ্ঞান জানা দরকার তার চর্চা করতে হবে। এর জন্য রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, জ্যামিতি, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান সব কিছুরই চর্চা একান্ত প্রয়োজন—এর মধ্যে ইকোলজি বিজ্ঞানের চর্চার বহুল প্রচলন হওয়া উচিত। সৌন্দর্যবুদ্ধির চর্চার প্রয়োগ হবে খাদি ও নানা গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে। অভিনয়ে, নৃত্যে, সঙ্গীতে এর আর এক দিক রূপ পাবে।

নৈতিক বিকাশ ঘটবে গান্ধীজী প্রবর্তিত গঠনমূলক কাজে,

যেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সত্যের পথে গড়ে উঠবে। ভজনে, কীর্তনে, রামায়ণ মহাভারত পাঠে ধর্মবোধের বিস্তার ঘটবে। এই আদর্শে চলতে গেলে মানুষের সঙ্গে মানুষের আদান-প্রদানে সমাজের অভিনব রূপ বিকশিত হবে। গ্রামপঞ্চায়েতের মারফৎ গ্রামের সঙ্গে গ্রামের, গ্রামের সঙ্গে প্রদেশের ও সর্বভারতের যোগ ঘটবে।

ভারতের প্রগতির এই যে অভিনব কল্পনা ও কার্যক্রম—এই মহৎ কাজে অংশ গ্রহণ করতে এগিয়ে এলে জীবন সফল হবে না কি?

গান্ধী স্মারক নিধি, বাংলার প্রকাশিত পুস্তকাবলী

গান্ধীজীর ন্যাসবাদ

সর্বোদয় ও শাসনমুক্ত সমাজ

গীতাবোধ

নারী ও সামাজিক অবিচার

পল্লী-পুনর্গঠন

সত্যই ভগবান